International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-II, January 2019, Page No. 1-13
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

রবীন্দ্রনাথের গানে অরণ্য ও তপোবনের কল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতি ও আধুনিক পরিবেশ চেতনার মেলবন্ধন

Samhita Bhattacharjee
UGC-NET Senior Research Fellow, Dept. of Rabindra Sangeet, Rabindra Bharati University, West Bengal, India

Absrtuct

Through this research article Tagore songs have been discussed with reference to Tagore's imagination and illustration of forest-scenario especially the ancient concept of 'Tapobon' of India (i.e. the forest for meditation, austerities etc.) which have been intermingled with his thought about nature and modern environmental concept. Today we know that, the excessive growth of Industrialization and urbanization is the main cause of depletion of forest cover from the mother earth. Therefore, according to modern environmental thought, imposing the recognition of intrinsic value on nature and thought of conservation of forest are very much important and all these ideas are very much akin to Tagore's views towards nature. In our oriental literature particularly in Indian Sanskrit literature and drama the illustration of 'Tapobon' was very much common and 'Tapobon' was considered to be the place of good harmonious interaction between man and nature and moreover nature was being worshipped there as God. On the other hand, western view is totally found to be reverse and against nature and environment. Therefore, that oriental view towards nature is very much relevant to today's environmental thoughts.. So, the main objective of this research article is to enquire as to how Rabindranath Tagore as a successor of such ancestral tradition, attemped to unify those oriental traditional values with today's modern environmental thoughts related to nature and how he tried to channelize this idea through his excellent and unique literary thoughts and imagination of forest on the lyrics of his songs of different thematic variations (Parjay).

Keywords: Imagination of 'Tapobon' *(তপোবনের কল্পনা),* ***Forest*** *(অরণ্য),* ***Nature*** *(প্রকৃতি),* ***Modern environmental thought*** *(আধুনিক পরিবেশ চেতনা),* ***Oriental views*** *(প্রাচ্য ভাবনা),* ***Western views*** *(পাশ্চাত্য ভাবনা),* ***Tagore songs*** *(রবীন্দ্রনাথের গান), পর্যায়* ***(Thematic variations), Oriental literature*** *(প্রাচ্য সাহিত্য),* ***worship of nature*** *(প্রকৃতি বন্দনা),* ***Harmony between man and nature*** *(মানব ও প্রকৃতির সম্মিলন)*
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i2.2019.1-13

"দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি....."
(সভ্যতার প্রতি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চৈতালি কাব্যগ্রন্থের 'সভ্যতার প্রতি' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তপোবন-চিত্রটিকে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন তার মূলে রয়েছে তাঁর এক গভীর প্রকৃতি চেতনা যা তার বিপুল সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শৈশবে যে কবি প্রকৃতিকে 'আড়াল-আবডাল' থেকে দেখার ও উপলব্ধি করার প্রবল বাসনা প্রকাশ করেছেন, তিনিই যে পরবর্তীকালে আপামর বাঙালি ও বিশ্বজনের দরবারে 'প্রকৃতির কবি' রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন তা বলাই বাহুল্য। আর এই গভীর প্রকৃতিবোধের মননশীল দিকটি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মচিন্তা, উপনিষদের শিক্ষা ও সর্বোপরি ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিতে, কর্মে, জীবনাদর্শে গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনায় ধরা দিয়েছে তপোবন-সমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতের কল্পনা। আর রবীন্দ্রনাথের এই তপোবনের কল্পনাই কোথাও গিয়ে তাঁর পরিবেশ চেতনা ও প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধের দিকটিকে করেছে প্রস্ফুটিত, যার অনুপম নান্দনিক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গানে।

প্রথমেই জানা দরকার তপোবন বলতে কি বোঝায় ? ব্যাকরণগতভাবে 'তপোবন' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায়- তপঃ+বন = তপোবন। 'তপঃ' অর্থে তপস্যা এবং 'বন' অর্থে অরণ্য। আক্ষরিক অর্থে তপস্যার বন বা অরণ্যই হল তপোবন ; অর্থাৎ তপস্যা বা সাধনার সঙ্গে যে অরণ্যের যোগ রয়েছে তা'ই হল তপোবন। এই তপোবনই ছিল একসময় ভারতের ঐতিহ্য; সাধনা ও জ্ঞানের আবাসস্থল। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তপোবন শব্দটির অনুপম ব্যাখ্যা প্রকাশ পেয়েছে 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের 'তপোবন' কবিতায় এভাবে-

"মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন
পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে ...
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন"।

এখন প্রশ্ন হল আধুনিক বিশ্বে এই তপোবনের কল্পনার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায় যে, বৈদিক ভারতের তপোবনে আর্য ঋষিরা তাঁদের সাধনা ও জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে একদিন যেভাবে দেখেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধি বা বোধ তাঁদের কখনো প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শেখায় নি বরং প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে প্রকৃতির সাথে সম্মিলিত হয়ে থাকতেই উদ্বুদ্ধ করেছে। আজকের আধুনিক বিশ্বের পরিবেশবিদরাও পরিবেশ ও বিশ্বপ্রকৃতিকে রক্ষা করার স্বার্থে প্রাচ্যের এই বোধ ও ভাবনাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে 'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি বলছেন- "আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়,

প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন"। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে এই সম্মিলন প্রকৃত অর্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-চিত্তের সম্মিলন, 'নিখিলের সঙ্গে যোগ' , 'ভুমার সঙ্গে মিলন'- যা ভারতের আরণ্যক ঋষিরা পেয়েছিলেন সাধনাকৃত উপলব্ধির দ্বারা। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে আফ্রিকা বা আমেরিকার অরণ্য সে কারণেই ভারতের অরণ্যের মতো 'তপোবন' হয়ে উঠতে পারেনি। সেখানে অরণ্যবাসী মানুষের বর্বরতার প্রবৃত্তিটিই প্রবল হয়ে উঠেছে ; মানুষ সেখানে নয় অরণ্য-প্রকৃতিকে ভয় পেয়েছে নয় তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। এর কারণ খানিকটা হলেও হয়তো সেসব দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও সেখানকার প্রতিকূল প্রকৃতি। আমাদের অরণ্য-আবৃত ভারত ভূখণ্ডে হিংস্র প্রাণীর অভাব ছিল না ঠিকই কিন্তু প্রকৃতির বিরূপতা ওইসব দেশের অরণ্যের মতো ছিল না। আমাদের অরণ্য সর্বদাই 'শান্তরসাস্পদ'। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে - "তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই"(তপোবন-রবীন্দ্ররচনাবলী সপ্তম খণ্ড)। বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ডঃ অরুণকুমার বসুর মতে- "প্রকৃতির সঙ্গে এই নন্দিত মিলন সাধনের পালাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের মুখ্য বৈশিষ্ট্য"। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিশিষ্টতা তাঁর অন্যতম সৃষ্টি, সঙ্গীতেও প্রভাব ফেলেছে। কাজেই ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ তপোবনের কল্পনা ও আধুনিক পরিবেশ চেতনাবোধ কিভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে এক সুরে মিলিত হয়েছে, তা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র প্রবন্ধটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ভারতীয় প্রাচ্য দর্শনে ও সাহিত্যে তপোবনের অস্তিত্বের যে প্রবহমান ঐতিহ্য রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার সাথে আধুনিক বিশ্ব পরিবেশ চেতনার একাত্মতার দিকটি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি হল প্রবন্ধের মূল অংশ যেখানে রবীন্দ্রনাথের গানে অরণ্য ও তপোবনের কল্পনা ও আধুনিক পরিবেশ চেতনা কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে তার কাব্যগত ও ভাবগত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে 'পরিবেশ' শব্দটি অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। কারণ সারা বিশ্ব জুড়ে নগরায়ণের নামে যেভাবে অরণ্যের ধ্বংসলীলায় মানুষ ব্যাপৃত হয়েছে তাতে করে ধরিত্রীর বুকে বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে দ্রুত এবং তার ফলে সমগ্র জীব জগৎ ও মানব সভ্যতার সংকট যে আসন্ন তা আজ আর কারো কাছে অজানা নয়। তাই তো পরিবেশবিদরা অরণ্য ও সর্বোপরি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিকে রক্ষার স্বার্থে বারংবার পরিবেশ সচেতনতার কথা বলেন। আর এই পরিবেশ সচেতনতা বিষয়টি অনেকটা নির্ভর করে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সাধারণভাবে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি মত প্রচলিত আছে সারা বিশ্বে। এর মধ্যে একটি হল Anthropocentric ধারণা, যেখানে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারে ও প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে এবং এই মত পশ্চিমের ধর্ম ও দর্শন গুলিতে জনপ্রিয় বলেই হয়তো পশ্চিম-দেশীয় সভ্যতাগুলির ভিত্তি অরন্য-কেন্দ্রিক নয় ; নগরকেন্দ্রিক। বলা বাহুল্য এই ভাবনাটি মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আর ঠিক সেই কারণেই এই মত পরিবেশ চেতনার বিরোধী। অন্যদিকে Ecocentric ধারণাতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে মানুষের প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার অধিকার নেই, বরং মানুষের উচিৎ প্রকৃতির সংরক্ষণের প্রতি মন দেওয়া ও

প্রকৃতির সাথে সম্মিলিত হয়ে থাকা। এটি প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ-কেন্দ্রিক মতবাদ। অন্যদিকে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও লেখক শ্রী অমিয় কুমার সেন তাঁর 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্মিলনের ভাবনাকেই হয়তো ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈতবাদী চিন্তার সাথে মিলিয়েছেন যেখানে প্রকৃতি ও মানবের একাত্মতার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট। আর এই প্রাচ্যের ভাবনাই ভারতবর্ষের তপোবন-সমৃদ্ধ বৈদিক সভ্যতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য এই বোধটিকেই কিন্তু আজকের আধুনিক পরিবেশ সচেতক মানুষ গ্রহণ করেছেন। তাই তো ধরিত্রীর বুকে অরণ্যকে ফিরিয়ে আনতে 'তপোবনের' ভাবনাটি আজ আর শুধুমাত্র Myth নয়; অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এক বিষয়। আর রবীন্দ্রনাথ 'তপোবন' প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই ভাবনার ফারাকটিকে বোঝাতে গিয়ে পাশ্চাত্যের মহান কবি শেক্সপিয়রের অরণ্য-কাব্যের সঙ্গে প্রাচ্যের আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের বনবাস কাহিনীর তুলনা টেনেছেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্যেও অরণ্য-কাব্যের অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু অরণ্য-প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে অনেকটাই পৃথক। এ প্রসঙ্গে তাঁর উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ- "শেক্সপিয়রের As You like It নাটক একটি বনবাসকাহিনী- টেম্পেস্টও তাই, Midsummer Night's Dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত- অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি"। অন্যদিকে রামায়ণের কথা উল্লেখ করে কবি বলছেন- "রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন... এই সমস্ত নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল"। সেটিই বৈদিক ভারতের দর্শন, বৈদিক ভারতের তপোবনের বৈশিষ্ট্য যেখানে আর্য ঋষিরা একদিন প্রকৃতির সাহচর্যে থেকে প্রকৃতির বন্দনা করেছেন। আর ভারতের এই সুদীর্ঘ বছরের তপোবনের সাধনা প্রকৃতির প্রতি যে বোধ ও দর্শন ভারতকে উপহার দিয়েছে তা গড়ে উঠেছে নান্দনিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার সংমিশ্রণে। সেখানে ছিল না কোনো অসহিষ্ণুতা, ছিল না হিংস্রতা। তাই তো প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তপোবন-সমৃদ্ধ ভারতের কল্পনায় সেই দর্শনটিকেই খুঁজে পাওয়া গেছে বার বার। সেইসব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রাজত্ব, ঐশ্বর্য প্রভৃতি বিষয়ের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে ঐতিহ্যপূর্ণ 'শান্তরসাস্পদ' তপোবনের কথা।

ভারতের সবচেয়ে প্রাচীনতম সাহিত্য ঋকবেদের দশম মণ্ডলে অরণ্যানী মন্ত্রে যেমন অরণ্য স্তুতির কথা পাওয়া যায় তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যেও শান্ত তপোবনের দেখা মেলে। তপোবনই যে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভারতীয় জীবন যাত্রার আশ্রয় তা মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-ই প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি হল- "অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কন্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র" (প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-তৃতীয় খণ্ড)। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যেও তপোবনে অকাল বসন্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার ভারতের মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তি- "কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়"। এছাড়া ভারতের দুটি বড় বড় মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এরও এক বিরাট অংশ অধিকার করে আছে তপোবনের চিত্র। রামায়ণে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস যাপনের চিত্রে কিংবা মহাভারতে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস যাপনের চিত্রেও এমন অরণ্যেরই দেখা মেলে, যেখানে পশুপাখিদের সাথে মানুষের নিরাপদ সহাবস্থান, যে অরণ্য প্রকৃত অর্থেই মানব সহ সকলের আশ্রয়দাতা। আর পরিবেশবিদ্যার একটি শাখা Deep Ecology-তেও গভীর ও

সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে মানুষ-সহ জড়-জীব সকলের এই প্রকৃতির বুকে এরূপ সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের কথাই বলা হয়েছে। কাজেই আজকের পরিবেশ চেতনা কোথাও গিয়ে এই তপোবনচিত্রের মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়। আর এখানেও রবীন্দ্রনাথের উক্তি- "ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্তই সেই তপোবনস্মৃতির সঙ্গেই জড়িত"।

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর সকল সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তাঁর গানকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন, তাই অরণ্য ও তপোবন কল্পনার নেপথ্যে যে নিভৃত প্রকৃতিবোধের সুরটি বেজেছে সর্বদা তা ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সঙ্গীত ভাবনাতেও। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন- "কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গান জিনিসটা প্রকৃতির।...সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে" (প্রবন্ধ-শ্রাবণসন্ধ্যা, শ্রাবণ ১৩১৭, সঙ্গীতচিন্তা)। আর এই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মিলনের ভাব রচনাই রবীন্দ্রনাথের গানে অরণ্য ও তপোবনের কল্পনার সাথে পরিবেশ চেতনাবোধের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে; কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো বা পরোক্ষভাবে। এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরি ভারতীয় কবিদেরই যোগ্য উত্তরপুরুষ। তাঁর সুবিশাল সঙ্গীতসাগরে অবগাহন করলে দেখা যায় যে গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ কৃত ছটি পর্যায় (পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক) এবং পরবর্তীকালে সংযোজিত বিভিন্ন পর্যায় গুলির (জাতীয় সংগীত, পূজা ও প্রার্থনা, আনুষ্ঠানিক সংগীত, প্রেম ও প্রকৃতি) গানে বিচিত্র ভাবনার সমাবেশ ঘটলেও প্রকৃতিকে কোনো পর্যায়েই ব্রাত্য করে রাখেননি কবি। তাই তো খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গানে বন ও অরণ্য-প্রকৃতির কল্পনারও অভাব নেই। তবে প্রকৃতি মানেই যে সেখানে সবসময় অরণ্যের কল্পনা এসেছে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং বলা যায় 'অরণ্য', 'বন'- এইসব শব্দের চয়ন ও ব্যবহার বিভিন্ন পর্যায়ের গানে বিভিন্ন অর্থ, ভাব ও তাৎপর্য বহন করেছে, যা রবীন্দ্রনাথের একেবারে মৌলিক সৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে অরণ্য ও তপোবনের কল্পনার যে বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তাকে কোনো পর্যায়ের সীমা-রেখায় বেঁধে ফেলা মুশকিল। সেই বিষয়েই এখন আলোকপাত করা যাক।

প্রথমেই আসি সেইসব গানের আলোচনায় যেখানে অরণ্যের কল্পনায় প্রাচীন ভারতের তপোবনের চিত্রটিকে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বেশ কিছু স্বদেশ বিষয়ক গানে এই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পূর্বে রচিত স্বদেশ সঙ্গীত গুলিতে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলেন বেদ-উপনিষদ তথা ভারতীয় আদর্শের শিক্ষা, তেমনই পেয়েছিলেন এমন একটি পরিবার, যাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে সমাজে যেমন সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তেমনই ছিল প্রবল স্বাদেশিকতা বোধ। তাছাড়া হিন্দুমেলার প্রভাবে সেই সময়কার স্বদেশ সঙ্গীত রচনায় প্রাচীন তপোবন-সমৃদ্ধ ভারতের বর্ণনার রীতি প্রচলিত ছিল। তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ এড়াতে পারেননি বলেই তাঁর প্রথম দিকের স্বদেশ পর্যায়ের গানে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও ভারতের মহিমা কীর্তনের বর্ণনায় বৈদিক ভারতের অরণ্য ও তপোবনের কল্পনাটিকেই আশ্রয় করেছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের উপলব্ধি ছিল "ভারতীয় সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয় বনে", তারই যেন সার্থক রূপ তাঁর এই গানগুলি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- ৩৫ বছর বয়সে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের ভৈরবী রাগাশ্রিত একটি গান- 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা'। এই গানটিতে কবি ভারতমাতার 'অনিলবিকম্পিত-শ্যামল অঞ্চল' রূপটি যেমন দেখেছেন তেমনি গানটির সঞ্চারী অংশে ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ তপোবনের কল্পনাটি ফুটে উঠেছে এভাবে- "প্রথম সামরব তব তপোবনে/ প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে"। এই গানটিতে তাই সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলন বা দেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে

উঠে অরণ্য-প্রকৃতি ও তপোবনের কল্পনা অবলম্বনে সনাতনী ভারতমাতার রূপটিই যেন প্রকট হয়েছে। আবার সামগান মুখরিত ভারতবর্ষীয় তপোবনের মঙ্গলময় রূপটি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র পর্যায়ের বসন্তের অনুষঙ্গের একটি গানে- "কমলবনের মধুপরাজি, এসো কমলভবনে"। এই গানটির শেষ লাইনটিতে কবি বলছেন- "সামগান উঠে বনপল্লবে, মঙ্গলগীত জীবনে"।
তবে সরাসরি 'তপোবন' শব্দটির প্রয়োগ না করলেও রবীন্দ্রনাথ অরণ্য আচ্ছাদিত ভারত মায়ের শ্যামল রূপটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন স্বদেশ পর্যায়ের আরও কিছু গানে। যেমন-

- ও আমার দেশের মাটি (তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা)
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি(কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে)
- সার্থক জনম আমার (শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে/ কোন বনেতে জানিনে ফুল)

আবার শুধুমাত্র ভারত মায়ের অরণ্য-শ্যামল ছায়ার নস্টালজিকতার চিত্রে আবদ্ধ না থেকে রবীন্দ্রনাথ অরণ্য-সমৃদ্ধ ভারতের পুনরুদ্ধার করতে অরণ্যের প্রতি মনযোগী হয়েছেন স্বদেশ পর্যায়ের অন্তর্গত একটি ব্রহ্মসঙ্গীতে- 'এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ'। এ গানের অন্তরার শেষ লাইনে কবি বলছেন - "সঙ্কটে দুর্দিনে হে রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে" অর্থাৎ ভারতের সঙ্কটের দিনেও কবি ভারতের 'অনির্বাণ ধর্ম শিখা'-টিকে সদা জাগ্রত রাখতে অরণ্যের প্রতিই মনোনিবেশ করতে বলেছেন- তাঁর মতে এটিই হল ভারতের পথ। যদিও গানটিতে তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ পদানত পরাধীন ভারতের সঙ্কটের ভাবনাটিই মুখ্য, কিন্তু এই অরণ্য-মুখিনতা হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন প্রকৃতি-চেতনার দলিল। স্বদেশ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ অরণ্য ও তপোবনের কল্পনার নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে 'জাতীয় সংগীত' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত আরো কিছু গানে-

১। একি অন্ধকার এ ভারতভূমি (ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান)
২। হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান (যে জীবন ছিল তব তপোবনে)
৩। নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা (না থাকে নগর আছে তব বন)

প্রথম গানটিতে একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীন ভারতের আরণ্যক ঋষিদের সামগান-মুখর অরণ্য চিত্রটিকে হারিয়ে ফেলার বিষাদগ্রস্থতা। তেমনই দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানে ঈশ্বরের কাছে তপোবন-সম্বলিত জীবন-মন্ত্রের দীক্ষা নিতে চেয়েছেন কবি। তাই তৃতীয় গানটির দ্বিতীয় স্তবকে কবি গর্বের সাথে বলেন-

"না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির কল্যাণে সুপবিত্র
না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র..."

অর্থাৎ এখানেও কিন্তু সেই অরণ্য-চিন্তাই রয়েছে যা কবির গভীর প্রকৃতি ও পরিবেশ চেতনার মর্মবাণীটিকেই প্রকাশ করেছে। এখানে কবি একদিকে যেমন বিশাল প্রাসাদ বা অট্টালিকার চাইতে 'কল্যাণে সুপবিত্র' পর্ণকুটিরই কাম্য মনে করেছেন, তেমনই পাশ্চাত্য-প্রভাবিত অতিরিক্ত নগরায়নের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে 'ফলে ফুলে সুবিচিত্র' অরণ্যে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে পশ্চিমী দুনিয়ায় বরাবর নগরকেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় উপনিবেশে নগর সভ্যতার যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল তা থেকে সরে আসার অঙ্গীকার রয়েছে কবির এই স্বদেশ

সঙ্গীতগুলিতে। এখানে তাঁর স্বদেশ চিন্তার সঙ্গে প্রকৃতি বোধ ও পরিবেশ চেতনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বিশেষত আজকের পৃথিবীতে অতিরিক্ত নগরকেন্দ্রিকতা যখন দেশ কাল নির্বিশেষে গ্রাস করছে অরণ্যকে তখন রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলির অভ্যন্তরে প্রবাহিত পরিবেশ চেতনার এই ফল্গুধারাটি আজকের পরিবেশ ভাবনার প্রেক্ষিতে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

আগেই বলা হয়েছে যে, অরণ্য-চিত্রের নানা রকমের ব্যবহার বিভিন্ন পর্যায়ের গানের ভাব প্রকাশে ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষত পূজা পর্যায়ের ঈশ্বর আরাধনা ও ঈশ্বরের প্রতি নিবেদনের গানে বৃক্ষাচ্ছাদিত শ্যামল ধরণী ও অরণ্যের উপমা ও অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। পূজা পর্যায়ের উৎসব উপ-পর্যায়ের একটি গান– "এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার"। এই গানে পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের আবাহনের বার্তাটি অরণ্য-প্রকৃতিতে যে আনন্দের হিল্লোল তুলেছে তা কবি গানটির সঞ্চারী অংশে প্রয়োগ করেছেন এভাবে– "বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা"। ঠিক একই ধরণের ভাবনা প্রকাশে অরণ্যের অনুষঙ্গ এসেছে রবীন্দ্রনাথের বহু নিবেদনের গানে। এমন কয়েকটি গান-

- তুমি ধন্য ধন্য হে (কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে) - পূজা
- মধুর, তোমার শেষ যে না পাই (শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়.../ শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ)–পূজা
- সার্থক কর সাধন (চম্পকবন করুক রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা)– পূজা
- হেরি তব বিমলমুখভাতি (ধ্বনিত বন বিহগকলতানে)– পূজা

আবার অরণ্যের অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রেমের গান অপরিসীম নান্দনিকতায় ঋদ্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

- শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায় (দূরকালের অরণ্যছায়াতলে)
- আজি গোধূলিগগনে (বনে বনে আজি একি কানাকানি)
- আমার মন মানেনা দিনরজনী (ওগো, বনমর্মরে নদীনির্ঝরে কী মধুর সুর লাগে)
- আসা যাওয়ার পথের ধারে (বকুল ঢাকা বনের ঘাসে)
- অবেলায় যদি এসেছ (আমার বনে দিনের বিদায়ক্ষণে)

তবে অরণ্যের চিত্র যে কেবল জাগতিক প্রকৃতির অঙ্গনে ধরা দিয়েছে এমন নয়, কবির নিভৃত হৃদয়ের অতলতা প্রকাশেও অরণ্যের উপমা এসেছে। "হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে" - এই ব্রহ্মসঙ্গীতে কবি আনন্দময় ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছেন অন্তরের নিভৃত স্তরের নন্দনকাননে যার অবস্থান মনের অন্তর্লোকে। অন্যদিকে "কার মিলন চাও বিরহী" গানটিতে যে অরণ্যের কথা কবি বলছেন সেটি বহির্লোকের। তাই এই গানটির দ্বিতীয় লাইনে কবি বলেন - "তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে"। এমন অরণ্যের খোঁজ মেলে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে। এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ–

- হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে (হৃদয়নন্দনবনে) - পূজা
- কোলাহল তো বারণ হল (মোর কাননে অকালে ফুল উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া)– পূজা
- আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে (নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে)- পূজা

- আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে (প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে)–পূজা

এখানে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভাবটি মুখ্য হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরে ও বাহিরে যে অরণ্যকে দেখেছেন তা কিন্তু গৌণ নয়।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন- "পৃথিবীকে ভালবাসিয়াছেন এ কথা কবি বহু কবিতায় নানাভাবে বলিয়াছেন; কিন্তু কবির সে-ভালোবাসায় প্রকৃতিকে বেশি করিয়া নিকটে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে, মানুষ সেখানে গৌণ। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়াছে মাত্র ..... 'বন ও রাজ্য', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'তপোবন' কবিতা-চতুষ্টয় একত্র পঠনীয়; কবির মন একটি বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যাইতে যাইতে তপোবনে আসিয়াছে"। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের এই কথা যে কতটা সত্যি তা প্রমাণ করে কবির প্রকৃতি পর্যায়ের এই বিখ্যাত গানটি- "আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ"। এই গানে প্রকৃতির মাঝে মানব হিসেবে নিজের যে ক্ষুদ্র ও গৌণ অবস্থানটি উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে অরণ্যের অপূর্ব সাহচর্যের চিত্র-রচনার মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর গভীর ও সামগ্রিক পরিবেশ চেতনা বোধ যা 'Deep ecology' র ভাবনার সাথে মেলে। প্রকৃতির গানে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই অরণ্যের চিত্রের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। তাই তো কবি বলেন- "ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে/ ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে/ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান''। অরণ্য-প্রকৃতির এই আনন্দের দান যেমন কবিমনকে মাতিয়ে তোলে, তেমনই আবার সেই আনন্দের প্রাণ প্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন বিশ্বপ্রকৃতির বীণার তারে। প্রকৃতি পর্যায়ের প্রথম গানটিতে তারই প্রতিফলন- "বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে/স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে/গিরিগুহা-পারাবারে"। গানটির শেষ তিনটি স্তবকে কবি বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর আবর্তনের যে অনুপম চিত্র এঁকেছেন তা যেন সেই বিশ্ব-প্রকৃতির সুর থেকেই উৎসারিত। যৌবনে শিলাইদহে পদ্মাপারে বাস এবং পরবর্তী জীবনে অধিকাংশ সময় শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে বাংলার ছটি ঋতুর লীলাকে কবি উপলব্ধি করেছেন হৃদয় ভরে। বাংলার ছটি ঋতুকে এমন উৎসবযোগ্য করে তুলে প্রতিটি ঋতুর আবাহন গীত ও বন্দনা গান রচনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানা নেই। আর এইসব বিশেষ বিশেষ ঋতুর বৈশিষ্ট্য ও আবহ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীতগুলিতে অরণ্য-প্রকৃতির চিত্রটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এখন সেই বিষয়টিই আলোচনা করা যাক। গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথের ২৮৩ টি গান পৃথকভাবে প্রকৃতির গান হিসেবে স্থান পেয়েছে প্রকৃতি পর্যায়ে। সেখানে প্রথম ঋতুই গ্রীষ্ম। যদিও "এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ"- এই আবাহন সঙ্গীতে গ্রীষ্মকে বরণ করে নিয়েছেন কবি। কিন্তু গ্রীষ্মের অরণ্য-প্রকৃতির রূপ খুব বেশি গানে প্রকাশ পায়নি, যেমনটা পাওয়া যায় বর্ষা আর বসন্তের অরণ্য বর্ণনায়। আসলে অরণ্যের শ্যামল রূপটি গ্রীষ্মের রূপের সাথে কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। কারণ গ্রীষ্মের অরণ্য শুষ্ক, তপ্ত, মরু-সম। এমন একটি গ্রীষ্মের গান- 'দারুণ অগ্নিবাণে রে/হৃদয় তৃষায় হানে রে'। এই গানে শুষ্ক তপ্ত কাননে ক্লান্তির ছবিটি স্পষ্ট। গানের অন্তরাতে তাই কবি বলেন- "শুষ্ক কাননশাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে/করুণ কাতর গানে রে"। আবার যখন 'আকাশ ঢাকা জটিল কেশে' কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটে তখন 'শুষ্ক কঠিন ধরা'-র বুকে উল্লাস জেগে ওঠে। কবি তখন বলেন- "হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে/বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে"।

আবার কবির প্রিয় ঋতু বর্ষার অরণ্যের বর্ণনায় এবং বর্ষার ফুল-ফল, বৃক্ষরাজি সহ সমগ্র প্রকৃতির রূপকল্প সৃষ্টিতে বর্ষার গান হয়ে উঠেছে তাঁর এক অপরূপ নির্মাণ। কবির কাছে বর্ষা প্রতিভাত হয়েছে 'শ্যামল সুন্দর' রূপে। উদাহরণ স্বরূপ- 'আহ্বান আসিল মহোৎসবে' গানটিতে বৃষ্টিস্নাত পুলকিত নৃত্যরতা অরণ্যের বুকে যে শ্যামলের অভিষেক রচনা করেছেন কবি তা এক কথায় অনবদ্য- 'পূর্ববায়ু চলে ডেকে, শ্যামলের অভিষেকে/অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে'। এরূপ শ্যামলের আবাহন ও অভিষেকের উৎসব বারংবার রচিত হয়েছে তাঁর বর্ষার গানে।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বর্ষাগানের ভাব প্রকাশে বর্ষাঋতুর উপযোগী বিভিন্ন পুষ্প ও বৃক্ষরাজি সম্বলিত অরণ্যের বর্ণনা এসেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। যেমন- যূথীবন, কদম্ববন, জামবন, আমবন, নীপবন, বকুলবন, কেয়াবন, তাল-তমাল বন প্রভৃতি। এরূপ অরণ্যের বর্ণনা রয়েছে বহু গানে–

- আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল (সজল হাওয়া যূথীর বনে)
- আকাশতলে দলে দলে (জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই)
- কদম্বেরই কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া (কদম্ব)
- নীলঅঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় (কদম্ববন গভীর মগন আনন্দ ঘন গন্ধে)
- বাদল ধারা হল সারা (কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি/মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি)
- এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
- চলে ছলোছলো নদীধারা (কূলে প্রফুল্ল বকুলবন/কোথা দূরে বেণুবন গায়)
- মন মোর মেঘের সঙ্গী (তাল-তমাল অরণ্যে)

আবার অরণ্যের বুকে বর্ষার কালো মেঘের ছায়ার ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথের বর্ষা গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এমন কয়েকটি গান–

- ছায়া ঘনাইছে বনে বনে
- আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি সাড়া (বনে বনের মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি)
- মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম (সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে)

শরত ও হেমন্ত দুটিই ক্ষণস্থায়ী ঋতু। শরতের গানে তবু শিউলি বনের বর্ণনা প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু হেমন্তের গানে অরন্য-প্রকৃতির প্রত্যক্ষ কোনো বর্ণনা নেই। শরত ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাব যেন 'শেফালিবনের মনের কামনা' হয়ে ফুটে ওঠে গানে গানে–

- শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি (শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি)
- তোমার নাম জানিনে সুর জানি(সারা বেলা শিউলি বনে)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গ্রীষ্ম আর শীত দুটি ঋতুরই রূপ শুষ্ক, কঠিন ও কঠোর। তবে দুইয়ের অরণ্য রূপের পার্থক্য রয়েছে - গ্রীষ্মের তপ্ত কানন। আর শীতের হিম শীতল বন। শীতের অরণ্য-প্রকৃতিতে ফুল ফোঁটার মেলা ফুরোয়, চলে জীর্ণ পাতা ঝরার খেলা, প্রকৃতির ভাঁড়ার হয় শূন্য। তাই কবি শীতের অরণ্যের বর্ণনা দেন এভাবে– "শিউলি ফোঁটা ফুরোল যেই ফুরোল, শীতের বনে এলে যে/ আমার শীতের বনে এলে

যে সেই শূন্যক্ষণে"। শীতের অরণ্যের রূপটি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে অন্য আরেকটি গানে- "শীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে/শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে"। এই গানেরই পরবর্তী অংশে কবি বলছেন-

"আমলকি ডাল সাজল কাঙাল, খসিয়ে দিল পল্লবজাল
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে
সইবে না সে পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুমকোলতা
উত্তরবায় জানায় শাসন, পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ-খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে"।।

শীতের বনের পাতা-খসানো-ফুল-ঝরানোর দিন শেষ হলে বসন্ত ঋতুর আগমনে অরণ্যের রূপ তখন রঙিন। তাই তো শিরীষ, পলাশ, বকুল, পারুল, শাল-পিয়াল, আমের মঞ্জরী, কনকচাঁপা, সন্ধ্যামালতী, মাধবীলতা প্রভৃতির অপূর্ব সমারোহে সুসজ্জিত অরণ্যের রঙিন স্বরূপটি ধরা দেয় রবীন্দ্রনাথের বসন্তের অসংখ্য গানে-

- কে রঙ লাগালে বনে বনে/ঢেউ জাগালে সমীরণে
- ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে(রঙে রঙে রঙিল আকাশ)
- আকাশ আমায় ভরল আলোয় (ওরে পলাশ ওরে পলাশ, রাঙা রঙের শিখায় শিখায়..... দখিন-হাওয়ার কুসুমবনের বুকের কাঁপন থামে না যে)
- পূর্বাচলের পানে তাকাই (সেই যে আমার বনের গলি রঙিন ফুলে ছিল আঁকা)
- আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি (বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত)

বসন্তের বনের বর্ণনা পাওয়া যায় আরো কিছু গানে–

- ওরে বকুল পারুল শাল-পিয়ালের বন
- নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এলো প্রাণে(মর্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে)

রবীন্দ্রনাথের চোখে বসন্তের আবির্ভাবে অরণ্যে যে উৎসব-মুখর সমারোহটি ধরা পড়েছে তার অপূর্ব প্রকাশ কবির প্রেম পর্যায়ের বসন্ত-অনুষঙ্গের এই গানটিতে– "আজি দক্ষিণপবনে/দোলা লাগিল বনে বনে"। তবে এই আনন্দ-উৎসবের আবহেও বিরহবিহ্বল এক হৃদয়ের কথা প্রকাশেও অরণ্য-প্রকৃতি প্রধান হয়ে ওঠে। তাই কবি বলেন–

"দিক্ ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি
বিরহবিহ্বল হৃৎস্পন্দনে।।
মাধবীলতার ভাষাহারা ব্যাকুলতা
পল্লবে পল্লবে প্রলপিত কলরবে।
প্রজাপতির পাখা দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়
উৎসব-আমন্ত্রণে"।।

তবে ঋতু গুলির অরণ্য-প্রকৃতির নান্দনিক বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি কবি। ঋতুগুলির আবাহন সঙ্গীত রচনায় প্রাচীন তপোবন-সমৃদ্ধ ভারতের প্রকৃতি ও অরণ্য বন্দনার রীতিটিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ–

১। নমো নমো, হে বৈরাগী–গ্রীষ্ম
২। নীলঅঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্ বৃত অম্বর (বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর)- বর্ষা
৩। আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে(প্রথম যুগের বচন শুনি মনে/নব শ্যামল প্রাণের নিকেতনে)-বর্ষা
৪। আমার নয়ন-ভুলানো এলে (আলোছায়ার আঁচলখনি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে.... বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি)–শরৎ
৫। বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী–বসন্ত

প্রথমে উল্লেখিত গ্রীষ্মের গানটিতে গ্রীষ্মের 'বৈরাগী' রূপের কল্পনায় আছে নটরাজের মূর্তি। দ্বিতীয় গানে অরণ্যকে 'বনলক্ষ্মী' রূপে কল্পনা প্রাচীন যুগের অরণ্য বন্দনার রীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে'– এই বর্ষার গানটিতে কবি-স্মৃতিতে প্রাচীন যুগের শ্যামল ঘেরা 'নিকেতনে'-র কথা এসেছে। সেখানেও সেই প্রাচীন ভারতের তপোবন-চিত্রটিরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। চতুর্থ গানে 'বনলক্ষ্মীর' রূপান্তর 'বনদেবী'তে, যার শঙ্খধ্বনিতে শরতের আবাহন ঘটে। অন্যদিকে বসন্তের গান "বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী"-তে ভুবনমোহিনী দেবীরূপে বসন্তের যে স্তব করেছেন কবি, সেখানেও দেবীর মহিমা প্রকাশ পায় অরণ্য ও প্রকৃতির চিত্রে–

"দিকপ্রান্তে, বনবনান্তে
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে
সরোবরতীরে, নদীনীরে
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী"।।

গানের এই চিত্ররূপটি কোথাও যেন তপোবনের কল্পনার মধ্যে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়।

আসলে অরণ্যই একদিন মানুষকে ঋতু-প্রকৃতির রূপগুলিকে উপলব্ধি করার যে সুযোগ দিয়েছিল পরবর্তীকালে অরণ্য বিমুখ সভ্যতাতে ব্যাপক উষ্ণায়ণ ও জলবায়ুর সংকট গ্রাস করেছে ঋতুচক্রের নিয়মকেও। আর রবীন্দ্রনাথ সেই ঋতুগুলিকে ফিরিয়ে এনেছেন শুধু লেখনীর ভাষায় নয়, তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত ঋতু-উৎসব, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি উৎসব পালনের মধ্যেও। তাঁর রচিত ফাল্গুনী, বসন্ত, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা প্রভৃতি ঋতুনাট্যগুলি সেই উৎসবেরই অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় নাটক, কাব্য বা সাহিত্যে অরণ্য-চিত্র, বিশেষত তপোবনের কল্পনার যে ধারাটি প্রবহমান তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যেও দেখা গেছে। বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়া গীতিনাট্য দুটিতে তপোবন চিত্রের বর্ণনার মধ্যেই রয়েছে কবির পরিবেশ ও গভীর প্রকৃতি বোধের নিদর্শন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে দস্যুদল আর 'কালমৃগয়া'-তে শিকারি দলের দাপটে যখন অরণ্যের গাছপালা-পশুপাখির অস্তিত্ব বিপন্ন তখন এই দুটি গীতিনাট্যেই তপোবনের শান্তিরক্ষা ও সর্বোপরি অরণ্য রক্ষার দায়িত্ব কবি অর্পণ করেছেন বনদেবতা ও বনদেবী-গণের হাতে। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে সেই ছবিটিই স্পষ্ট হয়েছে। এমন কয়েকটি গানের উদাহরণ নিম্নরূপ–

- সহে না, সহে না, কাঁদে পরান/সাধের অরণ্য হল শ্মশান- বনদেবীগণ (বাল্মীকি প্রতিভা, প্রথম দৃশ্য)
- কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে/সাধের কাননে শান্তি নাশিতে- বনদেবীগণ (বাল্মীকি প্রতিভা, চতুর্থ দৃশ্য)
- সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া- বনদেবতা (কালমৃগয়া, চতুর্থ দৃশ্য)
- ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে- বনদেবীগণ (কালমৃগয়া, চতুর্থ দৃশ্য)

অন্যদিকে নৃত্যনাট্য মায়ারখেলা, চিত্রাঙ্গদা-তে বিষয় ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক হলেও অরণ্যের দৃশ্য মূল নাট্যের দৃশ্যরূপ ও পটভূমিকা রূপে কাজ করেছে। যেমন–

- গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে (পর্বতশিখরে/অরণ্যে তমশ্ছায়া (চিত্রাঙ্গদা-প্রথম দৃশ্য)
- সখী, সে গেল কোথায় (আজি এ মধুর সাঁঝে/কাননে ফুলের মাঝে)- (মায়ারখেলা-তৃতীয় দৃশ্য)

শুধু গানের ভাষায় নয়, কবির তপোবন-কল্পনার বিরাট সাক্ষ্য বহন করে প্রকৃতির বুকে গড়ে তোলা তাঁর শিক্ষায়তন শান্তিনিকেতন। ভিড়ে ঠাসাঠাসি করা নগর জীবনকে কবি শিক্ষার অঙ্গনে রাখতে চাননি বলেই সেই প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও অরণ্য ছায়ার আশ্রমিক চিত্রটিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তাঁর শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনে। এই শান্তিনিকেতনের বুকেই কবি তাঁর পরিবেশ চেতনার বাণীটি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন গানে গানে; বৃক্ষরোপণ উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব প্রভৃতি পালনের মধ্য দিয়ে। আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসবের গানগুলিতে কবি বৃক্ষ ও অরণ্যানীর বন্দনা গানই গেয়েছেন–

- মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে- বৃক্ষরোপণ উৎসব
- আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল- বৃক্ষরোপণ উৎসব
- ফিরে চল্, ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে- হলকর্ষণ উৎসব

সমগ্র প্রবন্ধটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের হৃদয়াকাশে যে প্রকৃতি ও পরিবেশ-সচেতক সত্ত্বাটি আজীবন লালিত হয়েছে, তারই সার্থক রূপায়ন ঘটেছে তাঁর অরণ্য ও তপোবনের কল্পনায়। আর কবির অন্যান্য সৃষ্টির মতো তাঁর অন্যতম সৃষ্টি সঙ্গীতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, গান তাঁর কাছে শুধুমাত্র 'সুরের রাগরাগিণী' নয়, 'ভাবের রাগ-রাগিণী'। তাই তো সেই 'ভাবের রাগ-রাগিণী'-কে সম্বল করে অরণ্য ও তপোবনের কল্পনা ও আধুনিক পরিবেশ ও প্রকৃতি চেতনার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর সঙ্গীতে। তাই তো তাঁর গানে অরণ্যের চিত্র নানা রূপ-রস-গন্ধে বিচিত্র মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধে (শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ-উৎসবে কথিত) যে কবি অরণ্য-বিমুখতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন ও ধরিত্রীর বুকে অরণ্য ফিরিয়ে আনতে চান, তারই যেন অপরূপ সঙ্গীত রূপ–

"তোদের নবীন পল্লবে নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে মর্মরগীত-উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায় অমরাবতীর ধারাজল।
আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল"।

কাজেই সেই দিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ভাবনায় অরণ্য ও প্রাচীন তপোবনের কল্পনা যেমন একটি পৃথক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, তেমনই সেই কল্পনার অন্দরে যে প্রকৃতি ও আধুনিক পরিবেশ বোধটি রয়েছে তা তাঁকে ভারতের পূর্বসূরি কবিদের তুলনায় বিশেষত্ব দান করেছে। তাই তো তাঁর সেইসব গান হয়ে উঠেছে পরিবেশ চেতনার বাণী।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী (৩য় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা,(সুলভ সংস্করণ), পৃষ্ঠা -১৮, ১৯, ৭২৮
2. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৯০, ৬৯৬, ৬৯৮, ৬৯১, ৬৯২
3. বসু অরুণকুমার, বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৪১৯
4. সেন অমিয়কুমার, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৬
5. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃষ্ঠা- ১৫, ২২৩-২২৪
6. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান(অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা-১৬,
7. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ১৭, পৃষ্ঠা- ৪৪০, ৪৪১
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Ecocentrism
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocentrism